সুদীপ্ত সালামের দ্বিতীয় ছোটগল্পের বই

কায়েসের অজ্ঞাত লাশ

কায়েসের অজ্ঞাত লাশ

সুদীপ্ত সালাম

প্র কা শ ন

উৎসর্গ

প্রিয় অনুজ
রায়হান হক

সূচি

পাঠকের প্রণাম □ ০৭
অদ্ভুত আঁধার এক □ ১৩
বীজ □ ২১
ভয়ের চাবি □ ২৫
ভীষণ বেদনার রক্তচোখ □ ৩১
কেবিন নম্বর ১৬৪ □ ৩৯
দেশভাগের আগের ভাগ □ ৪৭
দেয়ালের দিকে মুখ □ ৫৩
একজন আইনুদ্দিন □ ৫৯
হিউম্যানয়েড মানুষ □ ৭৯
যখন ভাঙে ভয়ের দেয়াল □ ৮৫
কায়েসের অজ্ঞাত লাশ □ ৯১
কবির সংসার □ ১০৭
কৃষ্ণচূড়া রঙের শার্ট □ ১১৩
মহামারী, মহাজন ও মহাদেব □ ১১৭
রায়ান □ ১২১
শিল্পীর ক্ষুধা □ ১২৭
কীটের নাম জয়নাল □ ১৩১

পাঠকের প্রণাম

এই যে পাঠক হিসেবে বইটি আপনি হাতে তুলে নিলেন; ধরে নেই–সুদীপ্ত সালাম আপনার অচেনা। কেবল নামটি নয়, মানুষটিও। আপনার জানা নেই যে, সুদীপ্ত সালাম একজন আলোকচিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক এবং গণমাধ্যমকর্মী। তাহলে কায়েসের অজ্ঞাত লাশ ছোটোগল্পের বইটি আপনার বা আপনার মতো অনেকের কাছে তার নামের মতোই রূপকধর্মী। প্রচ্ছদে বইয়ের নামটি দেখে যেমন আমাদের প্রশ্ন জাগে–লাশটি যদি কায়েসেরই হয়, তবে সেটা অজ্ঞাত হয় কী করে? আর যদি অজ্ঞাতই হবে, তাহলে গল্পকার একটি সুনির্দিষ্ট নাম কেন নির্বাচন করলেন?

আমাদের শনাক্তকরণের চিরায়ত ব্যাকরণ আচমকা ধাক্কা খেলে নামগল্পটির কাছে হাঁটুমুড়ে বসতে পারি। যে সত্যকে আমরা এড়িয়ে চলতে ভালোবাসি, খানিকটা ইচ্ছে করেই; যে স্মৃতিগুলো আমরা বাক্সবন্দী করে রেখেছি, কতগুলো নির্দিষ্ট ছুটির দিন ছাড়া যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় না; ক্যালেন্ডারের যে তারিখগুলো আমাদের কাছে শুধুই উদযাপন কিংবা অতীত দিনের কথকতা–কায়েস সে সময়ের মানুষ। এমনকি তার লাশটিও। কিন্তু কায়েসের লাশ শনাক্তকরণের যে অপারগতা–কী আশ্চর্য! তা আজও সমানভাবে সক্রিয়। সাহস তাহলে ঐতিহাসিক, কেবল ভীরুতাই প্রাত্যহিক! আজও কত কায়েস, কত কায়েসের লাশ রয়ে গেছে অজ্ঞাতে। আমাদের উদযাপনকেন্দ্রীক রাষ্ট্র কিংবা

অধ্যাপনানির্ভর ইতিহাস তা খুঁজতে আগ্রহী নয়। লেখক সুদীপ্ত সালামের বুকপকেটে আমরা কায়েসের যে পরিচয়পত্রটি পাই, আদতে তা একটি রাষ্ট্রের জন্মসনদ। রূপান্তরের এ গানটি গল্পকারের নিজস্ব।

আখ্যানের সরলতার মধ্যে বক্তব্যের রূপান্তরধর্মীতা সুদীপ্ত সালামের গল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, গল্পের আখ্যানগুলো ততটাই সরল যতটা সরল হলে পাঠক বিরতিহীন পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সরল আখ্যানের খানিকটা পাঠের পর, প্রায় প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রেই, ভাবনাগুলোর কতগুলো স্তর-উপস্তর নির্মিত হতে থাকে। যেমন: বীজ গল্পটির কথাই ধরা যাক। বর্তমানে আমরা যে সমাজব্যবস্থার অংশ তাতে অধিকাংশ পাঠকই এ গল্পের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারবেন। গল্পটি পড়ে অনেকে হয়ত আবিষ্কার করবেন, তার নিজের ভাবনাগুলোও শফিকের শাশুড়ির মতো। কেউ কেউ হয়ত মনেও করেন, এ ধরনের ভাবনায় কোনো দোষ নেই। না, গল্পকারও কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। গল্পটি শেষ করতে করতে আমার অন্তত মনে হয়েছে, শফিকের বিষণ্নতার চেয়েও কথা শেষ করার পর তার শাশুড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে না-পারাটুকুই এ গল্পের মূলস্রোত। প্রায় একইধরনের প্রতিক্রিয়া দেয়া যেতে পারে দেয়ালের দিকে মুখ ও হিউম্যানয়েড মানুষ গল্প দুটোর ক্ষেত্রে। বিন্যাস যেখানে বক্তব্যে পাল্টে যাচ্ছে। এ রূপান্তর স্বতঃস্ফূর্ত এবং পাঠকের দিক থেকেই তৈরি হয়। তার মনোজগতের কম্পাসটি ঘুরে যায় গল্পে অনুপস্থিত তৃতীয় কোনো বক্তব্যে। কিংবা ধরা যাক রায়ান গল্পটি–যেখানে রূপান্তরের চেয়েও গল্পকারের রূপক ব্যবহারের শক্তিটুকু টের পাওয়া যায়। গল্পের রায়ান কি বোকা, নিঃসঙ্গ? টুকিনাদের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রায়ানকে বুঝতে পারি না আমরা। কিংবা পারি, কিন্তু স্বীকার করতে ভয় পাই।

ইতিহাসকে প্রেক্ষণে রেখে যে কোনো মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করা কেবল কঠিনই নয়, ঝুঁকিপূর্ণও বটে। একদিকে থাকতে হয় ঐতিহাসিক তথ্যের কৌমার্য রক্ষার শ্রম, অন্যদিকে কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয় ন্যারেটিভের বিশুদ্ধতা। মুশকিল হলো, শেষপর্যন্ত এ শ্রমের কোনোটাই পাঠকের হাতে তুলে দেয়া যায় না। তাহলে পাঠক বলবেন, প্রবন্ধ লিখলেই হতো, গল্প লেখার কী প্রয়োজন? বোধ করি এ কারণেই বিশ্বসাহিত্যেই অধিকাংশ ইতিহাসকেন্দ্রীক শিল্প হয় তথ্য-ভারাক্রান্ত, নাহয় সত্য-তথ্য-বিচ্যুত। এ গল্পগ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেন্দ্রীক কয়েকটি গল্প আছে। 'কয়েকটি' শব্দটি আমি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি। কারণ, ইতিহাসের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গল্পকার সুদীপ্ত সালামের আখ্যান নির্বাচন আর ভাষার আগুন তাতিয়ে তাতে সাহিত্যের সৌধ নির্মাণ–দুটো সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয়েছে আমার কাছে। যখন ভাঙে ভয়ের দেয়াল গল্পে আমরা সোবহানের যে জন্মান্তর দেখি–ইতিহাস সেখানে ফুটনোট; কিন্তু দেশভাগের আগের ভাগ কিংবা কৃষ্ণচূড়া রঙের শার্ট গল্প দুটোতে ইতিহাসই আখ্যানের সঞ্চারপথ তৈরি করেছে। বোধ করি এজন্যই যখন ভাঙে ভয়ের দেয়াল গল্পে আমরা সোবহানের মাধ্যমে পরিপার্শ্বকে চিনতে পারি; অথচ বাকি দুটো গল্পেই বিনয় বাবু কিংবা জুননু কেউ আমাদের কাতর করে না–বরং তারা যে বার্তা আমাদের জন্য বয়ে আনেন, তাতে আমরা তীব্রভাবে সংক্রমিত হই। সুদীপ্ত সালাম একজন আলোকচিত্রশিল্পী বলেই জানেন, কীভাবে ফ্রেমে রাখা একটি দৃশ্যকেও কেবল বার্তাবাহকের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা যায়; আবার ফ্রেমে না-থাকা দৃশ্যকে কী করে গড়ে তোলা যায় মূল বক্তব্য হিসেবে।

এক্ষেত্রে আলাদাভাবে যে গল্পটির কথা বলা প্রয়োজন, সেটা এ বইয়ের প্রথম গল্পটি–অদ্ভুত আঁধার এক। ফ্রেমে যে মানুষটিকে

আমরা দেখছি, যে সংসারের গল্পটি পড়ছি কিংবা আরও যারা প্রয়োজন অনুসারে ফ্রেমে এসেছেন–তারা প্রত্যেকেই একটি ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অংশ। কর্নেল জামিলের গাড়িটি ৩২ নম্বর অব্দি পৌঁছুতেও পারেনি; অথচ গোটা গল্পের যাবতীয় হাহাকার আর নৃশংসতা ওই একটি বাড়িকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এ গল্পটিতে গল্পকারের ভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পের শেষবাক্যে রেডিও থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটি চেনানোর জন্য সাহিত্যিক সুদীপ্ত সালাম যখন 'ধাতব' কথাটি ব্যবহার করেন, তখন হত্যাকারীর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়টি আমাদের সামনে চলে আসে। এমন অসামান্যতাকে কেবল শব্দ ব্যবহারের পারদর্শীতা হিসেবে দেখলে অর্ধেকটা দেখা হয়–প্রকৃতপ্রস্তাবে এ হলো বোধের প্রজ্জ্বলন। ইতিহাস-সচেতন একজন লেখক হিসেবে সুদীপ্ত সালাম তো জানেন, হত্যাকারী কেবল ব্যক্তি ছিল না, প্রতিষ্ঠানও ছিল–একটি নয়, অনেকগুলো।

আমার মতে, একজন আইনুদ্দিন গল্পটিতে গণমাধ্যমকর্মী সুদীপ্ত সালামকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। গল্পের অন্যতম দুটো চরিত্র সাংবাদিক বলে নয়; বরং প্রতিবেদনধর্মী ভাষার জন্য। তাছাড়া ভয়ের চাবি, ভীষণ বেদনার রক্তচোখ ও শিল্পীর ক্ষুধা গল্প তিনটিও অন্য কারণে রিপোর্টার সুদীপ্ত সালামকে পরিচয় করিয়ে দেয়। একজন আইনুদ্দিন গল্পে লেখক যেভাবে আখ্যানের বর্ণনা দিয়েছেন বা গল্পের বিন্যাস রচনায় যে সংবাদভাষ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তা নতুন একটি স্বাদ তৈরি করে। চারটি গল্প পড়ার ক্ষেত্রেই পাঠকের হয়ত মনে হবে, গল্প কোনদিকে এগুচ্ছে তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, তবুও তিনি পুরো গল্পটি পড়বেন। আগের রাতেই জেনে যাওয়া খবরটি যেমন পরদিনের পত্রিকায় আমরা খুঁটিয়ে পড়ি কিংবা ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়াভাষ্য

যেমন উপ-সম্পাদকীয়তে পড়ি–অনেকটা সে রকম। কেন পড়ি? মোটেও তথ্য জানার জন্য নয়; বরং তথ্যটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া ঘটমান বর্তমানটিকে জানার জন্য।

মোট ১৭টি গল্পের একটি পরিপূর্ণ বিন্যাস। পরিপূর্ণ কারণ গল্পগুলোর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। ফলে কোনো একটি নামে গোটা গল্পগ্রন্থটিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ১৭টি গল্পকেই যদি গল্পকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরি, তবে এটাও বলা প্রয়োজন–এ অভিজ্ঞতাগুলো সময় নিরপেক্ষ নয়। তাই প্রতিটি গল্পেই সময়ের স্ট্রোকগুলো বড্ডো তরতাজা।

এ তো গেল লেখক সুদীপ্ত সালামকে না চেনা পাঠকদের প্রতি নিবেদন। কিন্তু আমার মতোই যারা তাঁকে চেনেন, তারা নিশ্চয়ই জানবেন–কায়েসের অজ্ঞাত লাশ তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। তাঁর গল্পগ্রন্থের ভূমিকা লেখার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। আমি তাঁর একজন মুগ্ধ পাঠক। বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই কায়েসের অজ্ঞাত লাশ গল্পগ্রন্থটি পড়ার সুযোগ আমার হলো। প্রিয় শিল্পীকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সব ভাষা যখন একজন পাঠক হারিয়ে ফেলেন, তখনই কেবল শব্দের আশ্রয় নেন। আমি সে চেষ্টাটুকুই করলাম।

কায়েসের অজ্ঞাত লাশ জ্ঞাত হোক।

মারুফ রসূল
'উপন্যাস'
কুসুমবাগ, ১৮ কার্তিক ১৪২৯।

অদ্ভুত আঁধার এক

লাল ফোনের রিসিভারটি রেখে দিয়ে জামিল ফোনের কাছেই কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে রইল। তার বুঝতে বাকি নেই কি হতে যাচ্ছে। এতদিনের সামরিক অভিজ্ঞতা তাকে ফিসফিস করে বলছে—ওরা খালি হাতে ব্যারাকে ফিরবে না।

আনজুমানের ডাকে জামিল সম্বিৎ ফিরে পায়, 'কি? কি হলো?' জামিল বলল—'প্রেসিডেন্টের বাড়ি ওরা ঘিরে ফেলেছে।' আনজুমান অধীর হয়ে জানতে চায়—'কারা ঘিরে ফেলেছে! কেন!' জামিল উত্তর না দিয়ে বলল—'আমাকে এখনই ৩২ নম্বরে যেতে হবে।' আনজুমান দুহাতে জামিলের ডান হাতটি খপ করে ধরে ফেলে—'কি বলছ তুমি!' জামিল হাতটি ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে—'ভয় পেও না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। প্রেসিডেন্টের এমন বিপদে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না।' আনজুমান সব বুঝে, সে এও মনে করে—বঙ্গবন্ধুর বিপদে জামিলের ছুটে যাওয়া জরুরি। তারপরও প্রশ্নটি করেই ফেলে—'আমাদের কথা একবার ভাববে না?' জামিল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আনজুমানের ছলছল চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর শুধু বলে—'বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রেখো।' আনজুমান বুকে মোচড়ের ব্যথা অনুভব করে,

একটি প্রশ্ন হৃদয় ফুটো করে বেরিয়ে আসে—'জামিল না বলল, ও তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে? তাহলে বাচ্চাদের খেয়াল রাখার প্রসঙ্গ আসছে কেন!' জামিল তার কপালে একটি চুমু দেয়, প্রশ্নটি আনজুমানের আর করা হয় না।

জামিল নিজেই আলমারি খুলে পোশাক বের করে। আনজুমান জুতো-জোড়া নিয়ে আসে। জুতো-জোড়া পলিশ করেই রাখা ছিল, তারপরও আনজুমান পরম মমতায় শাড়ির আঁচল দিয়ে জুতোগুলো মুছে। ওদিকে জামিল ড্রেসিং টেবিলে কিছু একটা খুঁজছে, আনজুমান জানে তা কি। সে ওয়্যারড্রবের উপর থেকে জামিলের হাত ঘড়িটা এনে দেয়। ঘড়িটা পরতে পরতে এইমাত্র জামিল লক্ষ করল, এখন ভোর পৌনে পাঁচটা। সময় শুকনো বালি হয়ে দ্রুত গড়িয়ে পড়ছে।

জামিলের বড়ো মেয়ে তাহমিনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার তৈরি হওয়া দেখছে। জামিল বলল—'কি মামণি ঘুম ভেঙে গেল? সকাল হতে অনেক দেরি, যাও ঘুমিয়ে পড়।' মেয়ে এসব কথায় না গিয়ে সরাসরি বাবাকে প্রশ্ন করে—'তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা?' জামিল সরাসরি উত্তর দিতে পারে না। মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে জামিল বলে—'একটি জরুরি কাজ এসে গেছে মা। যাব আর আসব।' বাবা মেয়ের কয়েক সেকেন্ডের আলিঙ্গন। আনজুমান এসে মেয়েকে বলল, 'আম্মু বাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো, চলো ঘুমিয়ে পড়।' তারপর মেয়েকে নিয়ে সে চলে যায়। জামিলের তিন মেয়ে। বড়ো ও মেজোটা এক রুমে ঘুমায়, সবার ছোটো ফাহমিদা জামিলদের সঙ্গে। ওই তো বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। জামিল ঘুমন্ত মেয়ের গালে চুমু দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ফিরল। নিজেকে আয়নায় আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে একবার—তৈরি কর্নেল জামিল।

আনজুমান দুই টুকরো পাউরুটি ও একটি ডিম পোচ ডাইনিং টেবিলে রাখে। সে জানে এখন কোনোভাবেই জামিলকে তা খাওয়ানো যাবে না। তবুও। জামিল শোবার ঘর থেকে বের হয়ে দেখে আনজুমান ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলে সাজানো খাবার। জামিল শুধু বলল—'দেরি হয়ে যাবে...।' আনজুমান কথা বাড়ালো না। জামিল দুই মেয়ের ঘরের দিকে গেল। নিঃশব্দে দরজাটা একটু ফাঁক করে ঘুমিয়ে থাকা তাহমিনা ও আফরোজাকে দেখার চেষ্টা করল। আলোও জ্বালানো নেই। ভোরের অদ্ভুত অন্ধকার এখনও কাটেনি। তাই কেউ দেখতে পেল না, জামিলের চোখের নদীর বাঁধ ভেঙেছে। কিন্তু কেন? তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কি তাকে কোনও অশনি বার্তা দিচ্ছে? সে কি জেনে গেছে, সে এক অনিশ্চত যাত্রায় বের হচ্ছে? যদি তাই হয় তাহলে কেন তাকে এই যাত্রায় পা ফেলতে হবে? তার কর্তব্যবোধ তাকে সংশপ্তক হতে বাধ্য করছে?

সিঁড়ির দিকে নেমে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আনজুমান। তার চোখে ভয়ের ছায়া থাকলেও চোখ শুকনো। জামিল বের হওয়ার সময় একটু থামল, আনজুমানের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল—'চিন্তা কোরো না। বাচ্চাদের দেখো। দোয়া কোরো।' আনজুমান এবার আর কান্না ধরে রাখতে পারল না। নিঃশব্দে চোখের পানি ঝরছে। জামিলের বুক থেকে মাথা তুলে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিশ্রুতি চেয়ে বসল সে—'কথা দাও জীবিত ফিরে আসবে।' জামিল আকস্মিত এই কথায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কি বলবে সে! ঠিক তখন, বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লাল গাড়িটির হেডলাইট দুটি জ্বলে ওঠে—গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে আইনউদ্দিন। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ ভোরের নিস্তব্ধতা চিড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জামিল আনজুমানের কথা এড়িয়ে

যাওয়ার সুযোগ পেল। স্ত্রীর কপালে আবার চুমু খেয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যায় সে।

ঢাকার ভোরের সঙ্গে জামিলের পরিচয় অনেক দিনের। কিন্তু এমন ভোরের মুখোমুখি কখনও কি সে আগে হয়েছে? স্মৃতির সমুদ্রে তন্নতন্ন করে খুঁজেও জামিল এমন ভোরের মতো ভোরের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায় না। শখের ইয়াশিকা ম্যাট ক্যামেরা দিয়ে কত ভোরের ছবিই তো জামিল তুলেছে। এমন দানবীয় ভোরের প্রতিকৃতি কি ক্যামেরাবন্দি করেছে? ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটছে। বাড়ছে ধূসরতা। বাতাস নেই, প্রাণ নেই—সব থমকে আছে, স্থিরচিত্রের মতোই। পুব আকাশে চিরল লাল রেখা। জামিলের কাছে রক্তের দাগ মনে হয়। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় একটি কুকুরও নেই। থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। গুলি ও গুলির শব্দের কোনও দল নেই, পক্ষ-বিপক্ষের গুলির শব্দের কোনও পার্থক্য নেই। জামিল তাই বুঝতে পারে না কোনটি শত্রুর আর কোনটি বন্ধুর গুলির শব্দ।

বাতাসের গতিতে গাড়ি ছুটছে ধানমণ্ডির দিকে। জামিল আইনউদ্দিনকে বলল—'আরও দ্রুত চলো আইনউদ্দিন।' আইনউদ্দিন নিঃশব্দে গাড়ির এক্সেলেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দেয়। জামিলের মনে জড়ো হচ্ছে আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ফোর্স পাঠিয়েছেন তো? ফোর্স কি প্রেসিডেন্টের বাড়িতে পৌঁছাতে পেরেছে? গণভবনের ৩০০ গার্ড রেজিমেন্টেরই বা কি খবর? জামিল নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্টের পক্ষে কোনও ফোর্স না পৌঁছে থাকলে তাকে একাই ঘটনার মোকাবেলা করতে হবে। অবস্থার মুখোমুখি হতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার। ধনুকের মতো টানটান দৃঢ়তা তার রয়েছে।